চলচ্চিত্র অভিনেতা ফারুখ শেখের জন্ম ১৯৪৮ সালে গুজরাটের আমরোলিতে। বাবা মুস্তাফা শেখ ছিলেন মুম্বইয়ের আইনজীবী। জমিদার ও অভিজাত পরিবারের এই সন্তানের পড়াশোনা মুম্বইয়ের সেন্ট মেরি স্কুলে। স্নাতক হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে। পরে আইন পড়েছেন। বাবার পেশা গ্রহণ করে সফল হননি। কলেজ জীবন থেকে নাটকের প্রতি অনুরাগ। প্রেমেও পড়েন। প্রেমিকা রূপার সঙ্গে বিয়ে হয়। যুক্ত ছিলেন আইপিটিএ-র সঙ্গেও। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বলিউডে অভিনয়। সত্যজিৎ রায়, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। 'লাহোর' চলচ্চিত্রে সেরা পার্শ্বঅভিনেতার সম্মান পান।

বুধবার, ১১ চৈত্র ১৪২৬ ■ ৪০ বর্ষ ■ ৩০৫ সংখ্যা

অসচেতনতার চূড়ান্ত

চরম বিপর্যয়ের মুখে বিশ্ব। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোথাও লকডাউন, কোথাও কার্ফিউ জারি হয়েছে বটে। কিন্তু দেশবাসীর এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যা চূড়ান্ত অসচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে। লকডাউনকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতায় কার্যত টেক্কা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। পুলিশ লাঠি চালিয়েও সেই 'ডোন্ট কেয়ার' ভাবকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। কার্যত যেন ছুটির মেজাজে কাটাচ্ছে অনেকে। রাস্তায় খেলা থেকে, রকে আড্ডা দেওয়া কিংবা বাজারে গুলতানি ইত্যাদি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে। যেখানে যেখানে বাজার খোলা আছে বা দোকান চালু আছে, সেখানে হামলে পড়ছে ভিড়। ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কাও করছে না কেউ। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রবণতা রাজধানী কলকাতার চেয়ে জেলার শহরগুলিতে অনেক বেশি মারাত্মক চেহারা নিয়েছে।

অথচ দেশি, বিদেশি গবেষক, বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করছেন, এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবী জুড়ে করোনা ভাইরাস পুরোপুরি তেজি অবস্থায় সক্রিয় রয়েছে। ভাইরাসটি থেকে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রতিষেধক এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। যেসব দেশে ইতিমধ্যে এই ভাইরাস মারণ চেহারা নিয়েছে সেখানকার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা জানাচ্ছেন, সংক্রমণের হার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। ফলে ১৩০ কোটি মানুষের দেশে কতজন সংক্রামিত হতে পারেন, সেটা যে কেউ হিসেব করলেই বুঝে যাবেন। মৃত্যুর হার সংক্রমণের হারের তুলনায় কম বটে। কিন্তু সেই হারেও ১৩০ কোটির দেশে কতজনের জীবনহানি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রচুর প্রাণহানির সম্ভাবনার এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর একাংশের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলতে পারে।

সামান্য একটি পরিসংখ্যানেই সেই ভয়াবহতা বোঝা সম্ভব। স্বাস্থ্য দপ্তর খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গে করোনার প্রথম বলি যে প্রৌঢ়, তিনি আক্রান্ত হওয়ার পর ৩০০-রও কিছু বেশি লোকের সংস্পর্শে এসেছেন। এঁরা সকলেই কিন্তু করোনা ভাইরাসের বাহক হতে পারেন। সবাই না হলেও কেউ কেউ তো হবেনই। কিন্তু সেই ৩০০ জন আরও কতজনের সংস্পর্শে এসেছেন এবং সেই সংখ্যাটা আরও কতজনকে ছুঁয়েছে, তা ভাবলে শিহরিত হতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু বিদেশ থেকে নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকায় সেখানে কর্মরত এ রাজ্যের শ্রমিকরা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন। তাঁরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন। তেমন পরিকাঠামো না থাকায় তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়নি। ফলে গ্রামাঞ্চলগুলিও এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে গিয়েছে।

এই অবস্থায় সরকার বা প্রশাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা কিংবা সতর্কতার বালাই না রেখে লকডাউন ভেঙে বেরিয়ে পড়লে শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনা হবে না, গোটা দেশকে বিপন্ন করে ফেলা হবে। বাঙালি অনেক বেশি সচেতন ও কুসংস্কারমুক্ত বলে আমাদের এতদিনের গর্বও এখন প্রশ্নের মুখে। করোনায় রাজ্যে প্রথম মৃতের দেহ সংকারকে কেন্দ্র করে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, তাতেই অসচেতনতার পরিচয় মেলে। শ্মশানের পর শ্মশান ঘুরিয়ে দেহটি সংকার করতে প্রশাসন হিমসিম খায় কিছু মানুষের বাধায়। ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে দাহ করলেও সংক্রমণ ছড়াবে বলে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ওই লোকজন যে আচরণ করেছেন, তার চেয়ে অমানবিক আর কিছু হতে পারে না।

মানুষকে সচেতন করতে কিন্তু রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ব্যাপকভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে কিন্তু তাঁদের দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের ক্ষেত্রে সবাই যেন দায়িত্ব সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েই যেন সবাই ক্ষান্ত রয়েছে। দলীয় প্রভাব বা নিজের জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সচেতনতার প্রসারে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে না। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকতেই পারে। তা থাকা অস্বাভাবিক নয়। কেননা, ভাইরাসটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদেরও এখনও অনেক কিছু অজানা। কিন্তু সরকার ও বিশেষজ্ঞরা যখন বিপদ সম্পর্কে বারবার সতর্ক করছেন, তখন সে সব উপেক্ষা করা শুধু মূর্খামি নয়, অন্যায়ও বটে।

এই অজ্ঞতা ও অসচেতনতার অনিয়ন্ত্রিত প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়ারও কিছু ভূমিকা দেখা যাচ্ছে। সেজন্য সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব অনেক। ভুল ধারণা দূর করতে সংবাদমাধ্যম দায়িত্ববান ভূমিকা পালন করছে বটে। কিন্তু অযৌক্তিকভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায় বলে প্রচারের পিছনেও আছে সেই অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও কিছু ক্ষেত্রে কুমতলবও। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করে দিয়েছে, সংবাদপত্রের ছোঁয়ায় সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা নেই। এই প্রচারগুলিই সচেতনতা বাড়ানোর সহায়ক হবে। সমস্ত দায়িত্ববান নাগরিককে এখন অজ্ঞতা দূর করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

অমৃতধারা

অহং যত প্রবল, অপমানবোধ তত বেশি। যখন তুমি সত্যে সমর্পিত, তখন অবমাননা বোধ আসে না। অপমানকে ভয় পেলে না হবে বাস্তবজীবনের উন্নতি, না হবে আধ্যাত্মিক জীবনে চেতনার উন্মেষ।

'সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ' এই বোধ হল কর্মযোগের আর 'কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়' এই বোধ হল গভীর ধ্যানমগ্নতা। অতিরিক্ত শ্রম শ্রান্তি ও উত্তেজনার কারণ হতে পারে। নিয়মিত ধ্যান তোমায় করবে আবেগহীন, পক্ষপাতশূন্য ও প্রশান্ত। স্বল্পবাক হও। কম কথা তোমার সচেতনতাকে বাড়িয়ে তুলবে। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বন্ধ কর। নিজেকে দাতা না মনে করে দান কর। দোষ করলে তা খোঁচা দেবে তোমার মনে, তোমার বিবেককে উত্ত্যক্ত করবে আর ভুলটা পুনর্বার ঘটতে দেবে না। এই খোঁচাটা নিয়েই থাকো, অপরাধটা নয়।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

শব্দরঙ্গ ■ ২৫৬৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। নীচু কণ্ঠে পরস্পর আলাপ, গোপন পরামর্শ ৫। গৃহ, ভবন, বাস ভবনের অংশ, ভূসম্পত্তির অংশ, তালুক ৬। কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ, নতুন নিয়ম ৮। সুলক্ষণযুক্ত, ভাগ্যবান বা জল ৯। সপ্তাহের একটি বার, একটি গৃহ ১১। প্রধান সরকারি দপ্তরখানা ১৩। বাচনিক, মৌখিক ১৪। চিত্ত ও জীবন।

উপর-নীচ : ১। গুপ্ত হত্যা, গোপন হত্যা ২। ধাপ্পা, গোলাপ ফুল, বাজে বা মিথ্যা কথা ৩। জনরব, ভিত্তিহীন প্রচার ৪। বায়ু, বায়ুর অধিদেবতা ৬। নতুন, অভিনব ৭। হাতপাখা ৮। কণ্ঠভূষণবিশেষ, সম্মান বা প্রশংসার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত ধাতুর তক্তি ৯। পাটজাতীয় ক্ষুদ্র ও সরু গাছবিশেষ বা তার আঁশ ১০। চাঁদের অংশ বা কলা, সংস্কৃত ছন্দবিশেষ ১১। ছোট বানর বিশেষ ১২। উগ্র গন্ধযুক্ত কন্দবিশেষ ১৩। তির, দৈত্যরাজবিশেষ, তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ।

সমাধান ■ ২৫৬৫

পাশাপাশি : ১। পয়জার ৩। কলিল ৫। আনন্দলহরি ৬। তবল ৭। আর্জুনি ৯। আকাশকুসুম ১২। লহর ১৩। লিপিকর।

উপর-নীচ : ১। পক্ষপাত ২। রসুন ৩। কপিল ৪। লহরি ৫। আল ৭। আম ৮। নিত্যকার ৯। আদল ১০। শবর ১১। সুতলি।

আজীবন মানুষ নামে এক মহাদেশকে বারবার আবিষ্কার করেছি

প্রফুল্ল রায়

লেখক হিসাবে আমি আগাগোড়া হিউম্যানিস্ট এবং ভ্যালুজে বিশ্বাসী। আমার ধারণা মূল্যবোধ ছাড়া কোনও সমাজ বা মানুষ টিকে থাকতে পারে না।

লেখক হিসাবে আমি খুবই নির্জন। সব লেখকই হয়তো তাই। আমি মদ্যপান করি না। চা ছাড়া আমার অন্য কোনও নেশা নেই। সভাসমিতিতে যেতে আমার ভালো লাগে না। গোষ্ঠী বা দলে ভিড়ে গিয়ে সাহিত্যের কোনও আন্দোলন কখনও আমি করিনি। রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছা করে না। রাজনীতির কোনওরকম 'ইজমই' আমাকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করে না।

মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম আমাকে প্রেরণা দেয়। যা আমি জানি না, যা দেখিনি, নিজের অভিজ্ঞতায় যা লব্ধ নয়--এমন একটি বর্ণও আজ পর্যন্ত লিখিনি। আমার লেখক জীবনে সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রই আমার চেনা। নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে এখনও পর্যন্ত আমাকে পা ফেলতে হয়নি।

প্রসঙ্গত বলা যায়, লেখক হিসাবে আমি একদিকে যেমন ইনট্রোভার্ট, আর একদিকে পুরোপুরি বহির্মুখী। ফলে আমার পক্ষে উপজাতি জীবন থেকে শুরু করে নগর-মনস্ক লেখা সম্ভব হয়েছে। এসব রচনায় আমি কতটা সফল বা কতখানি ব্যর্থ সে বিচারের দায়িত্ব আমার নয়--সময়ের।

সেই সূত্রেই বলি, বহু বছর ধরে ভারতের নানা প্রান্তের, বাংলাদেশ আর এই বঙ্গের বিচিত্র সব জীবনের প্যাটার্ন আমি সাহিত্যে তুলে আনতে চেষ্টা করেছি। সমকালের আর কোনও লেখকের রচনায় এত বিচিত্র রূপ আছে কিনা, আমার জানা নেই। নিজের রচনা সম্বন্ধে একটি কথা না বলে পারছি না, আমার লেখায় একাধারে যেমন রয়েছে উষ্ণ হৃদয়ধর্মিতা, আর একদিকে নির্মোহ বিশ্লেষণ।

ভাষার ব্যাপারে আমি খুবই খুঁতখুঁতে। পছন্দমতো একটি শব্দ বা চিত্রকল্পের জন্য আমি এক ঘন্টা বসে থাকতে পারি। আমার প্রথম দিকের লেখায় ভালো ভালো শব্দ ব্যবহারের একটা ঝোঁক ছিল। শব্দকে সুস্বাদু খাদ্যের মতো জিভে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। তারপর ধীরে উচ্চারণ করে দেখতাম তার ধ্বনি কানে কেমন লাগে! মনের মতো হলে লিখে ফেলতাম। ফলে হত কি, ভাষা অনেক সময় লেখার বিষয় বা চরিত্রকে ছাপিয়ে যেত। পরে আমার মনে হয়েছে, কোনও লেখার ভাষাই তো সর্বস্ব নয়। বক্তব্যের প্রকাশে তার ভূমিকা সাহায্যকারীর। তবে এটা ঠিক যে, ভাষায় যে ভিটামিন আছে তা একটি লেখায় লাবণ্য এবং স্বাদুতা এনে দিতে পারে।

> সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বিশ্বজোড়া বিপর্যস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, বিপরীতে একটি সদর্থক ঘটনাও চোখে আসছে ভীষণভাবে। দূষণমুক্ত পরিবেশের পাশাপাশি ঘরে ঘরে আমাদের যৌথ জীবনের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার দিকটিও কম নয়। ভয়ের মাঝে এমন অভয়ও খানিকটা শ্বাস জোগায়। উচ্চ-নীচ, ধনী-গরিব, কালো-সাদার বিভেদও বেশ খানিকটা ভুলিয়ে দিয়েছে এই ভয়ংকর ভাইরাস। দানবীয় চেহারার পাশে যৎসামান্য হলেও এ এক মানবিক ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই শৃঙ্খল আরও বাড়ুক।

লেখকের একটি প্রধান কাজ হল, তাঁর লেখা মারফত পাঠকের সঙ্গে কমিউনিকেশন ঘটানো। আর এই কমিউনিকেশনের জন্য ভাষাকে হতে হবে সহজ, নির্ভার, মেদহীন এবং ঋজু। আজকাল আমার সব লেখায় বাড়তি অলংকার, চিত্রকল্প এবং উপমা কেটেছেঁটে ভাষাকে ঝকঝকে এবং স্মার্ট করতে চেষ্টা করি। বহু ব্যবহারে আমাদের ভাষার শব্দমালা জীর্ণ হয়ে এসেছে। তার প্রকাশের ক্ষমতা এবং ধার কমে যাচ্ছে। সেই কারণে কোনও চরিত্র বা আইডিয়া ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনমতো তেজী, একরোখা শব্দ এবং স্ল্যাংও ব্যবহার করি। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি নেই। মোটকথা, যে কোনও ভালো বা খারাপ শব্দ এবং যে কোনও বাক্যবিন্যাস ব্যবহার করে ভাষাকে সতেজ এবং প্রকাশক্ষম রাখতেই হবে।

এর পাশাপাশি এটাও সত্যি, কোনও লেখককে বুঝতে হলে তাঁর জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। তাঁর রুচি, মানসিকতা, পছন্দ-অপছন্দ এবং যে সামাজিক পরিবেশ থেকে তিনি এসেছেন সেসব সম্বন্ধেও জানতে পারলে ভালো হয়। এমনই একটি ঘটনার কথা বলি, যে চরিত্রটি আমার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিল।

গত শতকের ছয়ের দশকের বেশ কয়েকটা বছর আমার অধুনা মুম্বইতে কেটেছে। থাকতাম মূল শহর থেকে খানিকটা দূরে--জুহু তারা রোডের এক সস্তা গুজরাটি হোটেলে। সামনেই জুহুর ভুবন বিখ্যাত সমুদ্রসৈকত। সে সময় শহরতলির এই অংশটা ছিল ভারী নির্জন। আ-দিগন্ত আরব সাগর, মাইলের পর মাইল জুড়ে সোনালি বালুকাবেলা, অজস্র সি-গাল পাখি, সমুন্নত নারকেল গাছের অফুরন্ত লাইন--এই নিয়ে ছিল সেদিনের নয়ন ভুলানো জুহু। এখনকার মতো অগুনতি ফাইভ-স্টার হোটেল আর হাই-রাইজে জায়গাটা ছয়লাপ হয়ে যায়নি।

রোজ সূর্যোদয়ের অনেক আগে জুহু বিচে বেড়াতে যাওয়াটা ছিল আমার এক প্রিয় অভ্যাস। আমি সেখানে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই স্বাস্থ্যান্বেষীরা টাটকা দূষণমুক্ত বাতাসের সন্ধানে হাজির হয়ে যেত। তার আগেই এসে গেছে ঘোড়াওলারা, বায়ুসেবীদের জয়রাইডের জন্য তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। খোলা আকাশের নীচে ওই সাত সকালেই বসে যেত 'নারিয়েল পানি', ভেলপুরি, বাটাটাপুরি আর চায়ের অস্থায়ী দোকান।

বোম্বাই দেশের প্রান্তে, তাই সূর্যোদয়টা হয় অনেক দেরিতে। সমুদ্র তীরে ঘণ্টাদেড়েক হাঁটাহাঁটির পর রোদ উঠত। আমার চেনা জানা একটা চা-ওয়ালা ছিল। তার কাছে লেমন-টি পাওয়া যেত। রোজ প্রাতর্ভ্রমণের পর সেখানে কাগজের গেলাসে চা খেয়ে হোটেলে ফিরতাম। এই চায়ের দোকানেই ডি-সিলভার সঙ্গে আমার আলাপ। লোকটা গোয়াঞ্চি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার খ্রিশ্চান। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, দুর্দান্ত চেহারা, পেটানো স্বাস্থ্য। তার চোখেমুখে সর্বক্ষণ কথার খই ফুটত। নেচে কুঁদে এমন অঙ্গভঙ্গি করত যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়। সিনেমায় নামলে নাম-করা কমেডিয়ানদের সে নাক কেটে দিতে পারত। যত দিন যাচ্ছিল সে আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল। পরিচয়টা একটু গাঢ় হলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কী করো?'

ডি-সিলভা বলেছিল, 'আমি হোল-টাইম ফোরটোয়েন্টি।'

এমন একটা প্রফেশন কারও হতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। বিমূঢ়ের মতো বলেছি, 'তার মানে?'

'মানে আবার কী, ভেরি সিম্পল। যা বললাম সেটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও বুঝতে পারে।' বলেই অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল ডি-সিলভা, 'বোম্বাই সিটিতে কত লোক থাকে বলতে পারো?'

সেই তেষট্টি চৌষট্টিতে বোম্বাইতে জনসংখ্যা ছিল ষাট লাখের মতো। তাই বললাম।

ডি-সিলভা বলেছিল, 'এই ষাট লাখের ভিতর চল্লিশ লাখ গাধা নেই?'

তার এই প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বলেছি, 'তা আছে।'

'রোজ এদের একেক জনের মাথায় একটা করে টুপি পরালে আমার লাইফটা ফাইন কেটে যাবে, বুঝলে?' বলে চোখ টিপেছিল ডি-সিলভা। পরক্ষণে কী ভেবে শশব্যস্তে বলে উঠেছিল, 'তবে আমি গরিবদের কখনও পথে বসাই না।

এরপর থেকে ডি-সিলভার কর্মপদ্ধতি ভালো করে লক্ষ করতে থাকি। লোকটা যে সত্যিই অতি ধূর্ত ফেরেববাজ, সেটা টের পাওয়া গেল। কোনওদিন দেখতাম কারও চোখে ধুলো দিয়ে ডজনখানেক নতুন শার্ট নিয়ে এসেছে সে, কোনওদিন একবাক্স কেক বা একগোছা কারেন্সি নোট। সবই অকাতরে হাসিমুখে বিলিয়ে দিত।

জিজ্ঞেস করতাম, 'দিয়ে যে দিলে, নিজের জন্যে তো কিছুই রাখলে না!'

ডি-সিলভা বলত, 'নো সেভিং বিজনেস মিস্টার। রোজ নতুন নতুন প্ল্যান বার করে নতুন নতুন লোকের ঘাড় ভাঙব। যেদিন পারব না সেদিন স্রেফ ফাস্টিং'।

আমার মনে হয়েছিল এই শঠ, প্রবঞ্চক, দুর্ধর্ষ ফোর-টোয়েন্টি আসলে একজন মুক্তপুরুষ। তার মধ্যে রয়েছে নিরাসক্ত এক দার্শনিক। বম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর অনেকবার ওকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছি কিন্তু লেখাটা হয়ে উঠছিল না। আসলে ডি-সিলভা চরিত্রটি সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে বারংবার মনে হয়েছে গতানুগতিক পদ্ধতিতে লিখলে চলবে না। এর জন্য একটা অন্যরকম চমকপ্রদ স্টাইল উদ্ভাবন করতে হবে। ভাবতে ভাবতে একদিন সেটা মাথায় এসে গেল।

স্টাইল তো পাওয়া গেল কিন্তু ডি-সিলভাকে উপন্যাসের চরিত্র করে তুলব কী করে? একদিন তার ছকও তৈরি করে ফেলি। ডি-সিলভা একজন ছোট মাপের প্রবঞ্চক। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য, ধর্ম, রাজনীতি, পারিপার্শ্বিক সমাজ, সব কিছুর মধ্যে বিরাট বিরাট ফেরেববাজেরা বিরাজ করছেন। ডি-সিলভার চোখ দিয়ে এদের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছি। অবশ্য নানা কারণে ডি-সিলভা নামটি রাখা যায়নি, পরিবর্তিত হয়ে সে হয়ে গিয়েছিল পিটার স্বয়ম্ভু হোড়।

লেখক হিসাবে আমি আগাগোড়া হিউম্যানিস্ট এবং ভ্যালুজে বিশ্বাসী। আমার ধারণা মূল্যবোধ ছাড়া কোনও সমাজ বা মানুষ টিকে থাকতে পারে না। তাহলে গোটা দেশই পুরোপুরি সুন্দরবন হয়ে যায় বা জন্তুর আখড়ায় পরিণত হয়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা কারণে আমাদের পুরোনো মূল্যবোধগুলো ভেঙেচুরে গেছে ঠিকই, তবে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি, যেতে পারেও না। বাইরের দিকে সেগুলোর চেহারা বা 'ফর্ম' বদলে গেছে মাত্র। আমি এই মূল্যবোধগুলোকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি।

সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের আক্রমণে বিশ্বজোড়া বিপর্যস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, বিপরীতে একটি সদর্থক ঘটনাও চোখে আসছে ভীষণভাবে। দূষণমুক্ত পরিবেশের পাশাপাশি ঘরে ঘরে আমাদের যৌথ জীবনের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার দিকটিও কম নয়। ভয়ের মাঝে এমন অভয়ও খানিকটা শ্বাস জোগায়। উচ্চ-নীচ, ধনী-গরিব, কালো-সাদার বিভেদও বেশ খানিকটা ভুলিয়ে দিয়েছে এই ভয়ংকর ভাইরাস। দানবীয় চেহারার পাশে যৎসামান্য হলেও এ এক মানবিক ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই শৃঙ্খল আরও বাড়ুক।

আমার লেখার প্রথম এবং শেষ কথা হল মানুষ। মানুষের দুঃখ-সংগ্রাম, তীব্র প্যাশান আর আনন্দ, তাদের অস্তিত্বের সঙ্কট বা আত্মানুসন্ধান-এ সবই আমাকে লেখক হবার প্রেরণা দেয়। আজীবন মানুষ নামে এক মহাদেশকে আমি বারবার আবিষ্কার করে যাব।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

কিছুদিনের জন্য বাইরের মেলামেশা বন্ধ থাকুক

করোনা ভাইরাসকে বোধহয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলা ভুল হবে না। কারণ ইতিপূর্বে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবী হয়তো এতটা আতঙ্কিত হয়নি, যতটা আতঙ্কিত এই ভাইরাসে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মৃত্যুর পরিসংখ্যান বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো হিমসিম খাচ্ছে। ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারছে না। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ আমেরিকা, ইতালি ও স্পেন। এক্ষেত্রে আমাদের ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশ কীভাবে এর মোকাবিলা করবে?

যদি ধরেই নিই করোনা একটা যুদ্ধ, তাহলে এক্ষেত্রে আমরাও প্রত্যেকে একজন করে সৈনিক হতে পারি। একটা ভাইরাস আর ১৩০ কোটি সৈনিক – লড়াইটা অসম্ভব কিছু নয়। এর একমাত্র অস্ত্র সচেতনতা এবং সামাজিক মেলামেশা থেকে দূরে থাকা।

দৈনন্দিন ব্যস্ত জীবনে যে পারিবারিক সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছি সেটুকু না হয় এসময়ে নিজেদের ঘরে রেখে আমরা আবার খুঁজে নিই। প্রতিদিন তো বাইরে বাইরেই আমাদের জীবন কেটে যায়। কারও সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা, কারও বা ১০টা-৫টার ডিউটিতে। হয়তো অনেকদিন ভালোভাবে দেখা হয়নি মায়ের কালো চুল কবে থেকে একটু করে সাদা হতে শুরু করেছে। কিংবা বাবার বয়স কবে থেকে একটু বেশিই বেড়ে গিয়েছে বা বাড়ির পোষ্যটাও একটু সময় চায় কি না। তাছাড়া অতিরিক্ত ব্যস্ততা, ঝামেলায় পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝিও বেড়ে চলেছে। এই সময়টায় আমরা না হয় নিজেদের ঘরবন্দি রেখে পারিবারিক সম্পর্কগুলো নতুন করে গুছিয়ে নিই। সেইসঙ্গে দেশ ও পৃথিবীকে রক্ষা করি এবং ভাইরাসকে আর ছড়িয়ে পড়তে না দিই।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর যে সব বন্ধু আড্ডা দেয়, এই কয়দিন না হয় তারা ঘরে থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন্ধুদের খোঁজ নিল। এই কয়দিন না হয় আমাদের নতুন পোশাকটা আরও কয়েকদিনের জন্য আলমারিতেই থাকুক। আমাদের দু'চাকা, চার চাকাটাও না হয় একটু বিশ্রামে থাকুক। এই কয়দিন না হয় বাগানের গাছেদেরও একটু খোঁজ নিই, একটু যত্ন করি। এভাবেই না হয় আমরা নিজেদের ঘরে আটকে রাখি। এটা এমনও কিছু কঠিন কাজ নয়। কিছুদিনের জন্য বাইরের মেলামেশা বন্ধ রেখে অন্যভাবে জীবনটাকে দেখলে তো ক্ষতি নেই। তাতে দেশ ও পৃথিবী যেমন উপকৃত হবে, তেমনই পৃথিবীজুড়ে চলা মৃত্যুমিছিলকে আমরা হয়তো আটকাতে পারব। পাশাপাশি সরকারি নির্দেশ ও নিয়মকানুনটাও মেনে চলি। না হলে হয়তো ইতালির মতো পুরো পৃথিবীটাই একদিন নীরব হয়ে যাবে। এছাড়া আরও বড় কথা, আমাদের আপনজনেরা আইসোলেশন থেকেই চলে যাবে, শেষ দেখাটাও আর হবে না।

সম্পা পাল
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

সচেতনতার বড়ই অভাব

করোনা প্রতিরোধে যখন নিজের ও সমাজের স্বার্থে নিজেকে গৃহবন্দি রাখা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন অনেকে বলা ভালো একটা বড় সংখ্যার মানুষ হুজুগে পড়ে পিকনিক করতে ব্যস্ত। কেউ আবার অতিরিক্ত ছুটি পেয়ে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করেছে। আবার অনেকেই অতি আতঙ্কিত। তাঁরা বাজারে গিয়ে খাদ্যসামগ্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এমনভাবে কেনাকাটা শুরু করেছেন যেন কিছুক্ষণ বাদে আর কিছুই পাওয়া যাবে না। দেশে মনে হয় খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। এতে করে যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা হয়তো অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ঘরে বোঝাই করতে পারছেন। কিন্তু অন্যদিকে গরিব অসহায় মানুষগুলোকে ক্ষুধার যন্ত্রণার মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

দু'হাত ও দু'পায়ে আমরা সকলেই মানুষ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমাদের মান-হুঁশ কবে জন্মাবে সে হিসাব আমরা কেউই মনে হয় জানি না। হয়তো প্রকৃতি নিজের মতো করেই সব হিসাব মিলিয়ে দেবে। পৃথিবী আবার শান্ত ও সুন্দর হবে। মানুষে মানুষে বিভেদ দূর হবে। প্রকৃতির এই মারণলীলা বন্ধ হবে।

মিঠুন ভট্টাচার্য
শ্রীবাস কলোনি, সাউথ কলোনি বাজার, সাহুডাঙ্গি, জলপাইগুড়ি।

খবরের প্রতিবাদ

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত 'গৌতমকে ঘিরে জুনিয়ার ডাক্তারদের বিক্ষোভ' শীর্ষক খবরটি আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। এই কঠিন সময়ে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা একান্তভাবে প্রয়োজন। জুনিয়ার ডাক্তাররা তাদের সমস্যার কথা আমাকে বলেছে। কোনও সময়ই তারা কোনও বিক্ষোভ দেখায়নি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুরোধ করেছিল, তাদের কিছু বিষয় নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে মিটিং করা দরকার। তাদের মনোবল বাড়ানো এবং তাদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার সঙ্গে তাদের অনুরোধ মেনে এবং মেডিকেল কলেজের সব প্রোটোকল মাথায় রেখে মিটিং হয়েছে। একইভাবে শিলিগুড়ি হাসপাতালেও মিটিং হয়েছে। আইএমএ-র দার্জিলিং জেলার কর্মকর্তারা অনুরোধ করেছিলেন, তাঁদের কিছু পরামর্শ আছে এবং সেই পরামর্শ নিয়ে তাঁরা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। সেইমতো আইএমএ-র ডাক্তারদের সঙ্গেও মিটিং হয়েছে। এই অবস্থায় যথাসম্ভব আইসোলেটেড থেকে, মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে এবং সরকারি নির্দেশিকা মেনে আমরা সবাই কাজ করছি। কিন্তু কিছু জরুরি পরিষেবা চালু রাখার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে এবং মানুষের স্বার্থেই এই কাজ আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করছি।

আপনার সংবাদপত্রে যথাযথ সংবাদ পরিবেশন করলে বাধিত হব। কোনও ডাক্তার আমার মুভমেন্ট নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেননি। এই খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমার কাছে সব ফোটো ও ভিডিও আছে। প্রয়োজনে আপনার তথ্যের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারি।

গৌতম দেব
শিলিগুড়ি।

রাজবাড়ির সমস্যা

কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাজবাড়ি আবাসন। দু'তিন বছর আগের এবড়োখেবড়ো খানাখন্দে ভরা রাজবাড়ি হাউজিং রোডের কথা মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর জনমত বিভাগে এই রাস্তার সমস্যার কথা লিখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর নজরে আনি। তারপর তিনি রাস্তাটি পাকা ও এলইডি আলোর ব্যবস্থা করে দেন। এইজন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। যাই হোক, এখন সমস্যা হল, হাউজিং রোডের একধারে আবাসনের দেয়াল ঘেঁষে কংক্রিটের পাকা নর্দমাটি নোংরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নর্দমা পরিষ্কার না করায় আবর্জনা জমে নর্দমা তার গতিপথ হারিয়েছে। ফলস্বরূপ বদ্ধ জলে ডেঙ্গি মশার চাষ হচ্ছে। নর্দমাটি নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যাপারে ওয়ার্ড কাউন্সিলার, পুরপ্রধান কিংবা রাজবাড়ি আবাসনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হেলদোল নেই। বরং একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে তৎপর। একই অবস্থা আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরেও। সেখানকার ঘরগুলি সবসময়ই ড্যাম হয়ে থাকে। তাই নতুন কোনও আবাসিক এলে গ্রাউন্ড ফ্লোর কয়েকদিন বাদে ছেড়ে দেন। এতে সরকার আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়। পাশাপাশি নিরাপত্তারও অভাব রয়েছে। ক'দিনের জন্য কোনও আবাসিক ছুটিতে গেলে চুরি অবধারিত। আবাসনের মাঠের একপাশে রাজবাড়ি উদ্যানের একটি গাছ দীর্ঘদিন ধরে দেওয়াল ভেঙে পড়ে রয়েছে, তা সরানোর জন্য সরকারি কোনও উদ্যোগ নেই। ভ্যাট নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না আর আবাসনের ভিতরে পুর পানীয় জলের কোনও লাইন নেই। আমরা পাশের অন্য ওয়ার্ড থেকে পানীয় জল আনি। পুর কর বকেয়া নেই। তাহলে প্রশাসন নিশ্চুপ কেন? এই ব্যাপারে পুরপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অন্যদিকে, মান্টু দাসপল্লি লাগোয়া কালীমন্দির থেকে ভবানী হল সহ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা পর্যন্ত নর্দমার নোংরা উপচে রাস্তার উপরে উঠে আসছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কারও হেলদোল নেই। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি দেখুন।

শর্মিলা সরখেল
রাজবাড়ি আবাসন, কোচবিহার।